আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শরৎকালীন সংখ্যা

আশ্বিন ১৪৩০

আশ্বিন এসে গেল তাহলে। মায়ের আসার সময় হয়ে এল প্রায়। বাঙালির সম্বচ্ছরের উৎসবের দিন সমাগত। সামাজিক মাধ্যমগুলিতে এখন কেবল দিন গোনার পালা। আকাশে বাতাসে চিরচেনা সেই আগম্নী গানের সুর নয় নয় করে ঠিক বেজে উঠেছে, ‘এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না ...’ দিন গোনার পালা সাঙ্গ হোক। সবাই আনন্দে মাতুন। সুখে পূর্ণ হোক ধরাতল।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আবার এসে গেল উৎসবের দিনগুলি। আর মাত্র মাসখানেকও নেই, উমা আসছেন বাপের বাড়ি।

প্রস্তুতির পারদ চড়ছে মণ্ডপে মণ্ডপে। প্রকৃতির বুকেও, যতই বৃষ্টির শেষ না থাক , তবু কিন্তু তার মধ্যেও দেখা দিতে আরম্ভ করেছে প্রস্তুতির ইশারা --- তা সে যতই পণ্ডিতেরা বলুন না কেন দেবীর এবারকার আগমন বিসর্জনে নাকি রয়েছে অমঙ্গুলে একটা ইঙ্গিত। দেবীর এবার নাকি আগমন ঘোটক অর্থাৎ কিনা ঘোড়ায়, আর গমনও তা-ই। এবং দুইয়েরই ফল নাকি ছত্রভঙ্গ। স্বভাবতই যেহেতু দেশজুড়ে এখন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ডামাডোলের কাড়ানাকাড়া , ফলে আশঙ্কা একটা রয়েই যাচ্ছে। কিন্তু মা যেহেতু জগজ্জননী, আনন্দময়ী , ফলে আশঙ্কার মধ্যেও রয়ে যাচ্ছে শান্তি কামনার ছোঁয়া। সবার ভালো হবে আশা করাই যায়। করা উচিতও।

সূচিপত্র

সফল হল চন্দ্রযান-৩, এবার লক্ষ্য সূর্য Page 4
অলক সামন্ত

পটুয়াপাড়ার মাটি-সাজ Page 7
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (দ্বিতীয় ভাগ) Page 9
আদিত্য ঠাকুর

পাওয়া গেল সবথেকে প্রাচীন উল্কাপিণ্ড Page 14
অলোকেশ দাশ

সাবধান হোন বয়েস বাড়লেই Page 16
শ্যামল দেবনাথ

চলে গেলেন অস্কার জয়ী চিত্রপরিচালক ফ্রিডকিন Page 18
তাপস মুখোপাধ্যায়

স্বাদে-নস্টালজিয়ায় অনন্য দিলখুশা কেবিন Page 20
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

সুমেরুতে সাতদিন (শেষ ভাগ) Page 22
রাজর্ষি পাল

অজানার উজানে (দ্বিতীয় ভাগ) Page 27
বাবলু সাহা

রবীন্দ্রনাথের গানে নিজেকে হারিয়ে খোঁজা Page 30
অলোক দেব

প্লেয়ার তৈরি করতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয় Page 32
প্রণব দত্ত

লেখা ১

সফল হল চন্দ্রযান-৩, এবার লক্ষ্য সূর্য

অলক সামন্ত

অবশেষে সফল হল চন্দ্রযান-৩ । এবং সঙ্গেসঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞানে ইতিহাস তৈরি করে ফেলল ভারত। ইসরোর হাত ধরে ভারতই প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখল। সেই সঙ্গে চাঁদের মাটিতে মহাকাশযান অবতরণকারী চতুর্থ দেশ হিসাবে (রাশিয়া, আমেরিকা, চিনের পরেই) উঠে এল ১৪০ কোটির এই দেশ। সাফল্য উদ্‌যাপনের মাঝে ইসরোর লক্ষ্য কিন্তু স্থির। এ বার তাদের পাখির চোখ 'চন্দ্রযান-৪' ।

চন্দ্রাভিযানকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে আগ্রহী ইসরো। তবে খবর বলছে সেই পর্যায়ে আর ভারত একা নয়। অন্য এক দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগোবে ইসরো। জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাক্সা (জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি)-র সঙ্গে সে বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। ভারত এবং জাপান যৌথ ভাবে 'চন্দ্রযান-৪' অভিযানে কাজ করবে। এই অভিযানের আসল নাম লুপেক্স (লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশন)। লুপেক্সে মূলত চাঁদের মেরুকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ চালাবে ভারত এবং জাপান। খুঁজবে সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্নটির জবাব– চাঁদে কি আদৌ জল আছে ?

গত কয়েক বছরে চাঁদের চারপাশে কৃত্রিম উপগ্রহ, টেলিস্কোপ এবং নানাবিধ ক্যামেরার সৌজন্যে জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলেছে। লুপেক্স সেই বহুচর্চিত জল্পনার অবসান করবে বলে আশা বিজ্ঞানীদের। তার ফলে আগামী দিনে চন্দ্র অভিযানের গতিপ্রকৃতিও বদলে যেতে পারে। তবে এই অভিযান সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য জানা

যায়নি। লুপেক্স বা ‘চন্দ্রযান-৪’ ভারত এবং জাপানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিও ঘটাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এই অভিযান চালু করা হতে পারে।

বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদের মাটিতে পা রেখেছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এবার এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হবে ভারতের নাম। চূড়ান্ত পর্যায়ের এই অবতরণ প্রক্রিয়ায় ১৯ মিনিট সময় লেগেছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরু এখনও সবার কাছেই অজানা। পৃথিবীর আর কোনো দেশই সেখানে পৌঁছতে পারেনি। সেখানেই পৌঁছে নতুন কীর্তি গড়ল ভারত। এবং গড়ল নজিরবিহীন কম খরচে। কীরকম ? হিসেব বলছে, বিনোদনের বাজারে বার্বির বাজেট ছিল ১৪৫ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ওপেনহাইমারের বাজেট ছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার। আর আরেকটি হিসেব বলছে আদিপুরুষ তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। আর চন্দ্রযান-৩-এর বাজেট ৬১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ আদিপুরুষের থেকেও ৭৫ কোটি টাকা কম লেগেছে চন্দ্রযান-৩ তৈরিতে, যার মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এর ল্যান্ডার, রোভার এবং প্রপালশন মডিউল তৈরি করতে। যদিও মিশনের লঞ্চ সার্ভিসের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৩৬৫ কোটি টাকা।

চাঁদের পর এ বার ইসরো-র লক্ষ্য সূর্য। চন্দ্রবিজয়ের পরেই তাদের পরবর্তী অভিযানও শুরু করে দিয়েছে তারা। শ্রীহরিকোটার সতীশ ভধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যেই সূর্যের দিকে পাড়ি জমিয়েছে ‘আদিত্য এল ওয়ান’ । চন্দ্রযান ৩-এর ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যেই এই মিশনও ঘটিয়ে ফেলেছে তারা। এবং সূর্যের নামেই প্রকল্পের নামকরণও করা হয়েছে ‘আদিত্য এল ওয়ান’ । হিসেব মতো ১২৫ দিনের যাত্রা শেষে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিমি দূরে ল্যাগরাজ পয়েন্ট বা এল ওয়ান পয়েন্টে পৌঁছে সেখান থেকে সূর্যের উপর নজর রাখবে এই আদিত্য এল ওয়ান। কাজ চলছে গগনযানেরও। প্রসঙ্গত ইসরো-র প্রথম ম্যানড মিশন বা মহাকাশচারীদের

নিয়ে অভিযান হতে চলেছে এই ‘গগনযান’ । সম্ভবত ২০২৫ সাল নাগাদ মহাকাশে যেতে চলেছে গগনযান। অভিযানের প্রারম্ভিক ধাপ সম্পর্কে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের শেষেই জানানো হবে ইসরোর পক্ষ থেকে।

চন্দ্রযান-৩ -এর মাইলস্টোন সমান সাফল্য এখন উপভোগ করছে ভারত। দেশ তথা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন স্রোতে ভেসে চলেছে। কিন্তু কেন চাঁদের দক্ষিণ মেরুকেই বেছে নেওয়া হল অবতরণের জন্য ? ভবিষ্যতে সেখানে

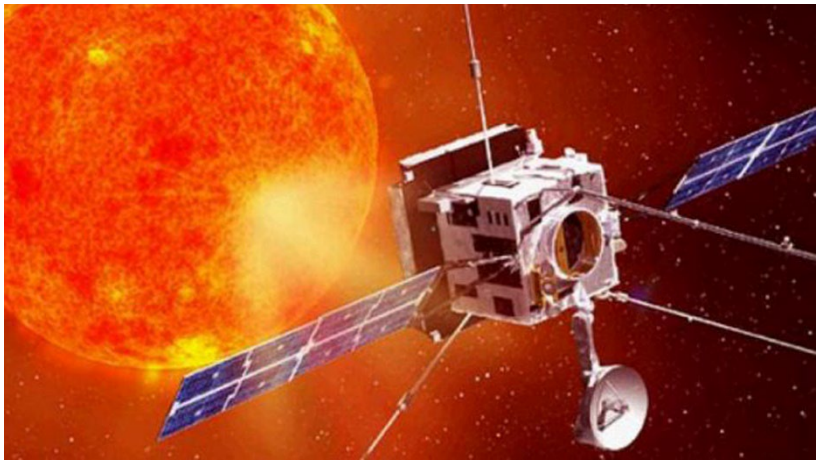

মনুষ্যবসতি তৈরির সম্ভাবনা আছে বলেই কি ? প্রসঙ্গত ৪০ দিন ধরে যাত্রা শেষে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছয় চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছল ভারত। সার্বিকভাবে চন্দ্র অভিযানের নিরিখে ভারত চতুর্থ দেশ। আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে অভিযান করে সফল হল ভারত। চাঁদের মাটিতে মহাকাশযানের প্রথম সফল অবতরণ করায় রাশিয়া। ১৯৫৯ সালে 'লুনা ২" চন্দ্রযান চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণ করে। ১৯৬৯ সালে চাঁদের বুকে প্রথম মানুষ পাঠায় আমেরিকা। অ্যাপোলো মিশনে সফলভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে মানুষ। এরপর সফল চন্দ্রাভিযান ছিল চিনের চ্যাংই-৩ মিশন।

লেখা ২

পটুয়াপাড়ার মাটি-সাজ

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

আর মাত্র একটি মাসের অপেক্ষা, বছর ঘুরে ফিরে আসতে চলল বাঙালির বড়ো পার্বণ। তাই ভাদ্রের রৌদ্রে-জলে ভ্যাপসা গুমোটের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ ঝলমল করে উঠছে আকাশ। নীলাকাশে নানা আকারে ভেসে বেড়াচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ তুলো-মেঘ; জানান দিচ্ছে, শরৎ আসতে চলেছে। পাশাপাশি সেজে উঠছে পটুয়াপাড়া।

পায়ে পায়ে চলতে দেখা কালীঘাটের পটুয়াপাড়া, যেখানে ঢুকলেই চোখ টেনে নেয় খড়-মাটির সাজ। সামনেই দুর্গাপুজো। কেমন চলছে প্রস্তুতি?

“মলমাসে তেমন কাজ এগোনো যায় না” বললেন জনৈক মহিলা শিল্পী। প্রতিমার কারিগর স্বপন পাল আরেকটু বিস্তার করে বলেন, “প্রস্তুতি বলতে মাটির কাজ এগিয়েছে। এখন গনেশ পুজো, আর বিশ্বকর্মা গড়া চলছে। তারপরে শুরু হবে দুর্গাপ্রতিমার কাজ ” ।

তবে এই মুহূর্তে অন্যান্য মূর্তির কাজ পুরোদমে চললেও, দশহাতের দেবী এবং তাঁর পা ছুঁয়ে মহিষাসুরের খড়ের কাঠামো উঁকি দিচ্ছে – গণেশ-বিশ্বকর্মার পাশ থেকেই। শরতের গন্ধের আভাষ পেয়ে দেবোপক্ষের প্রতীক্ষায় আনচান করে উঠছে সকলেরই মন। চোখ না-ফোটা, মাটি লেপা দেবী ও অসুর মূর্তির অবয়বগুলো রীতিমতো জানান দিচ্ছে, দেবীর মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী রূপে আবাহনের জন্য মুখিয়ে রয়েছে আর মাত্রই একমাস, এবং কিছু দিন।

সুভাষ চিত্রকরের স্টুডিয়োয় গণেশ ও বিশ্বকর্মার কাজ চললেও, দেবীপ্রতিমার কাজ প্রায় অর্ধেক রেডি। “এরপর, প্রতিমার অবয়বগুলো ভালো করে মুছেটুছে শিরিষ কাগজ ঘষে, রঙ লাগাবার অপেক্ষা” ।

আবার উলটো দিকে ভোলানাথ চিত্রকরের স্টুডিয়োয় দুর্গাপ্রতিমার এখনও তেমন একটা দেখা নেই। সে প্রসঙ্গে জানতে চাইতেই উত্তর পাওয়া গেল -- অর্ডার প্রায় তিনমাস আগে থাকতেই হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে অল্প সময়ে প্রতিমা নির্মিত হবেই বা কী করে?

ভোলানাথ চিত্রকর জানাচ্ছেন, “আজকাল অনেক ক্ষেত্রে তা-ই। করতে হয়। মার্কেটের ধরন এখন অনেক বদলে গেছে। অনেকেই এখন শেষমুহূর্তের একেবারের দোরগোড়ায় পৌঁছে তারপর প্রতিমার অর্ডার দিতে চায়। তাতে যদি বাজেট কিছুটা হলেও কমে, সেটাই উদ্দেশ্য” । পাশাপাশি আক্ষেপ ঝরে পড়ে প্রতিমাশিল্পীর কথায়, “দুর্গাপ্রতিমার অর্ডার আগের চেয়ে কমে গেছে, অন্তত আমাদের মতো ছোটোখাটো প্রতিমাশিল্পীদের কাছে। বড়ো পুজোর উদ্যোক্তারা এখন সবাই বড়ো বড়ো শিল্পীদের স্টুডিয়োয় বায়না দিতে ছোটে” । সুতরাং তাঁদের মতো ছোটোখাটো শিল্পীদের কাছে বারোমাসের কাজই ভরসা, দুর্গাপুজোয় বাড়তি অর্ডার কিছু যদি পাওয়া যায় সেটাই লাভ। প্রয়োজনে, একেবারে শেষমুহূর্তের অর্ডারি কাজও করতে হয় তাঁদের -- জানালেন ভোলানাথ চিত্রকর।

তবে সব মিলিয়ে, আশ্বিনের শারদ প্রাতে-র ঠিক আগে, পটুয়াপাড়ার মেটে আবহাওয়ায় শোনা যাচ্ছে সেই আবাহনেরই আগাম সুর।

লেখা ৩

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (দ্বিতীয় ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

আমরা আজ যা বিজ্ঞান বলে মানি তার ভাষা যেমন অঙ্ক এবং পরীক্ষার দ্বারা যাচাই ছাড়া কোন তত্ত্বকে যেমন গ্রহণ করি না, প্রাচীন কালে সেই অর্থে বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নি। জ্ঞানী মানুষ যাঁদের ঋষি বলে অভিহিত করা হত তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনেক সময়ই জটিলতার কারণে রূপকাকারে গল্প কাহিনীর মাধ্যেমে ব্যক্ত করতেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যটি পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে। অনেক পৌরাণিক আখ্যান আর লৌকিক উৎসবের দিকে ফিরে তাকালে ঘটনার উৎসমূলে আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে খুঁজে পাব। এই নিয়ে গত সংখ্যায় শুরু হয়েছিল নতুন ধারাবাহিক। দ্বিতীয় অংশ এই সংখ্যায়…

এবার এই উপাখ্যানের তাৎপর্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। প্রথম যে প্রশ্ন আসে তা হল, প্রজাপতি দক্ষ কে ? দক্ষ হলেন আকাশে অবস্থিত নক্ষত্রচক্র বা পরবর্তী কালের রাশিচক্র। এই নক্ষত্রচক্র বা রাশিচক্রের প্রেক্ষাপটে গ্রহ সমূহ চলাচল করে। সূর্য পথ বা ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) এই রাশিচক্রের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। সূর্য সারা বছরে এই বৃত্তপথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নক্ষত্রে ও রাশিতে অবস্থান করে। বছরের বিস্তৃতি এবং ঋতুর আগমন ও গমন নক্ষত্রচক্রে সূর্যের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। প্রাণীকুলের জীবন ধারণ নির্ভর

করে ঋতু বিন্যাসের ওপর। এই নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে যিনি পরিচালনা করেন এবং জীবনের প্রবাহ যিনি দক্ষতার সঙ্গে বজায় রেখেছেন তিনিই প্রজাপতি দক্ষ। দক্ষ প্রজাপতিই সংবৎসরাত্মক কাল ও রাশিচক্র। সুতরাং দক্ষ প্রজাপতি কোন প্রাণময় সত্বা নন।

যজ্ঞ বলতে আমরা এখন বুঝি আগুন, ঘি, নৈবেদ্য এবং ভোজনের সমাহার। কিন্তু ঋগ্বেদে যজ্ঞের অর্থ ছিল – জীবনের কর্ম, কর্মের কাল সংবৎসরব্যাপী। সেই নিমিত্ত বছরের নামান্তর ছিল যজ্ঞ। যিনি বৎসর শুরু করেন তিনি যজ্ঞপুরুষ বা কালপুরুষ। দক্ষের যজ্ঞই এই সৃষ্টি প্রবাহ।

দেব শব্দের বৈদিক অর্থ কী ?

দেব শব্দের ধাত্বর্থ প্রত্যক্ষ প্রকাশমান প্রাণের আধার-জ্যোতিষ্ক। ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ীভূত জ্যোতিষ্কলোকই বৈদিক দেবতা।

এই পরিসরে ঋষি শব্দের অর্থও জেনে নেওয়া যাক।

ঋষ্ ধাতু হতে ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন। ঋষ্ ধাতু গত্যর্থক, গতির অর্থ গমন, জ্ঞান, প্রাপ্তি ও পূজা, এটি শ্রুতি, সত্য ও তপস্যাসূচক, এইসমস্ত গুণের আধার হচ্ছেন ঋষি। সুতরাং আকাশে অবস্থিত তারা, গ্রহ এরাও ঋষি। সৃষ্টির শুরুতে এই বিশ্বে যা কিছু গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল তাই ঋষি। আদিতে যিনি সৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি ঋষি। তাঁর পশ্চাতে যাঁরা সৃষ্টি বা উৎপন্ন হলেন তাঁরা পরমর্ষি বা মহর্ষি। স্বয়ং গতি বা স্পন্দন থেকে যিনি উদ্ভুত তিনি স্বয়ম্ভু ঋষি। বায়ু পুরাণ মতে, পরিমান দ্বারা যে পুর অবগত হওয়া যায় না, সেই পুর হতে স্বয়ং উদ্ভুত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র গ্রহগণও ঋষি নামে খ্যাত। যাঁরা সর্বগুণের আধার স্বরূপ মহান্ত, তাঁরা মহর্ষি পদবাচ্য। প্রাথমিক ভাবে সংজ্ঞায়িত দেবতা, ঋষি প্রাণময় সত্বা নন, বরং তা ছিল আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক। মানুষের ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে যাঁরা অহংকার ও অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করেছেন তাঁরাও ঋষিত্ব প্রাপ্ত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঋষি এবং তাঁদের ঔরসজাত মৈথুন দ্বারা উৎপন্ন পুত্রগণ ঋষিক নামে অভিহিত হন।

সুতরাং দেবতা এবং ঋষিগণের একটি অংশ আকাশে অবস্থিত সূর্য, গ্রহ, তারা। অপর ঋষিরা পৃথিবীর মানুষ। একই ভাবে মর্তের শ্রেষ্ঠ মানবরাও দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভ কালে রাশিচক্রের অস্তিত্ব ছিল না, ছিল নক্ষত্রচক্র। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন নক্ষত্র মানে তারকা বা তারা নয়। সূর্য পথ বা ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে ৯° পরিমাণ, অর্থাৎ আকাশে ৩৬০° ব্যাপৃত উত্তর দক্ষিণে ১৮° পরিমান বিস্তৃত একটি কাল্পনিক চওড়া পটি বা belt হচ্ছে নক্ষত্রচক্র। ঋগ্বেদের প্রারম্ভ কালে এই নক্ষত্রচক্রকে ২৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি ভাগ এক একটি নক্ষত্রভাগ (Group of stars) বা সংক্ষেপে নক্ষত্র। নক্ষত্রভাগের উজ্জ্বলতম তারা বা ক্রান্তিবৃত্তের নিকটতম তারার নামে নক্ষত্রভাগের বা নক্ষত্রের নামকরণ হত। যে তারাটির নামে নক্ষত্রভাগের নাম রাখা হত, সেই তারাটিকে যোগতারা বলা হয়। ফলে নক্ষত্রভাগ বললে বুঝতে হবে আকাশের নির্দিষ্ট অঞ্চলের কিছু তারার গুচ্ছ (Group of stars)।

ভারতীয় বর্ষপঞ্জি কে পঞ্চাঙ্গ বলা হয়। পঞ্চাঙ্গে নক্ষত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। পৃথিবীকে পরিক্রমার সময় চাঁদ আপাত ভাবে কিছু স্থির তারার কাছাকাছি আসে, যে তারাগুলি ক্রান্তিবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবী পরিক্রমা কালে "যে সময়ে চাঁদ ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) ২৭ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ অর্থাৎ আকাশে ১৩° ২০' কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই সময়কাল-কে এক নক্ষত্র বলা হয়" । সুতরাং চাঁদের এক নক্ষত্রভাগ পথ পেড়িয়ে আসতে এক নক্ষত্রকাল সময় লাগে। এই নক্ষত্রকাল সময়ের পরিমাণ নির্ভর করে, চাঁদ তার কক্ষপথের কোথায় অবস্থান করছে তার ওপর। ফলে দুটি আলাদা নক্ষত্রকালের সময়ের পরিমাণ ভিন্ন। সুতরাং শুধুমাত্র "নক্ষত্র" শব্দের উল্লেখ থাকলে দেখতে হবে কোন উদ্দেশ্য সেটির ব্যবহার হচ্ছে – সময়ের নাকি আকাশের অংশ হিসেবে।

প্রাচীন কাল থেকেই আকাশকে কৌণিক ভাগ করার একক ছিল "অংশ" । এক অংশ এবং ১° -র মান সমান ও অভিন্ন। আকাশ গোলককে ২৮ ভাগে ভাগ করা হলে প্রতি ভাগের মান দাঁড়ায় (৩৬০÷২৮)°=১২পূর্ণ ৬/৭° বা ১২° ৫১'২৫.৭১"। প্রাচীন কালে ষষ্টিক পদ্ধতিতে কৌণিক মান গণনা করা হত। এক নক্ষত্রভাগের বিস্তৃতির যা মান পাওয়া গেল, তা ভগ্নাংশ, ফলে দীর্ঘ সময়ের পরে গণনা বিচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল।

বৈদিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য ছিল সূর্য ও চাঁদের গতি ও অবস্থিতি নির্দ্ধারণ, সৌর ও চান্দ্রবর্ষের সামঞ্জস্য বিধান, কাল ও ঋতু নিরূপণ এবং গ্রহণ গণনা। এই সমস্ত কাজ করার জন্য আকাশ পর্যবেক্ষণ ও তার হিসাব রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন সায়ন বর্ষ (Tropical Year) শুরু হত বসন্ত ঋতুতে, সূর্য যখন মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থান করতো। মৃগশিরা নক্ষত্র কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলীর অন্তর্গত।

কালপুরুষকে যজ্ঞপুরুষও বলা হত প্রাচীন বৈদিক যুগে। যজ্ঞ অর্থাৎ সম্বৎসর শুরু হত মৃগশিরা নক্ষত্রের থেকে। আখ্যানে উল্লেখ আছে "মৃগরূপে পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করেছিলেন বীরভদ্ররূপী রুদ্র বা মহাদেব" । এই কথা বলা হয়েছে মৃগশিরা এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রতিকী রূপের কথা ভেবেই। ঋগ্বেদকালে কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলের আর্দ্রা তারার(Betelgeuse) নাম ছিল রুদ্র। যজ্ঞ নষ্টের অর্থ বছর শুরু এবং সূর্যের বিভিন্ন নক্ষত্রে সংক্রমণের যে গণনা আগে প্রচলিত ছিল, সেই গণনাকে পরিত্যাগ করা। এখানে যজ্ঞপুরুষ মহাকাল বা মহাদেব স্বয়ং যজ্ঞ নষ্ট করছেন। এটি অবশ্যই প্রতীকী।

সূর্যের মতো চাঁদেরও আকাশে চলন হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা সম্পর্কে জানা থাকলেও বৈদিক যুগের প্রারম্ভ কালে তিথির ধারণা আসেনি। তখন দিন হতো নক্ষত্রের নামে।

স্থির তারার সাপেক্ষে চাঁদের ৩৬০° আকাশ পরিক্রমায় সময় লাগে ২৭.৩২ দিন (চাঁদের নাক্ষত্রিক মাস বা Sidereal Lunar Month)। প্রাচীন বৈদিক কালে গৃহীত ২৭.৩২ দিনকে ২৮ নাক্ষত্র দিনের সমান এবং তার সাথে সূর্যের চলনের ফলে সৌর দিবসের এবং সংবৎসরকালের হিসাব মিলানো অত্যন্ত দুরুহ হয়ে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর শেষে ভুল প্রকটিত হয়। ফলে ঋতু নির্ধারণ এবং বর্ষ শুরুর ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল সেই যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঋষিদের।

সুতরাং তাঁরা কাল সংশোধনের ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন ২৮ নক্ষত্রের স্থলে ২৭ নক্ষত্রের প্রচলন করলে সময়, ঋতু নির্ধারণ ইত্যাদি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম অনেক সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। ৩৬০° কে ২৭ দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশ হয় না। সেক্ষেত্রে এক নক্ষত্রভাগের মান হয় (৩৬০÷২৭)° বা ১৩° ২০'। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভগ্নাংশের কারণে যে ভুল হচ্ছিল তা পরিহার করা যাবে।

যেহেতু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক এই জটিলতা সাধারণ নাগরিকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এবং কতিপয় জ্ঞানী ঋষির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল সুতরাং এই নিয়ম চালু করতে গেলে তা প্রশাসনিক স্তরেই করতে হবে। দু-একজন ঋষির পক্ষে এই বিধান দেওয়া সম্ভব নয়। প্রশাসনিক জটিলতা এড়িয়ে কোন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মের ও রূপক আখ্যানের আশ্রয় নেওয়া সে যুগে সুবিধাজনক ছিল। সেই কারণে একটি রূপক আশ্রিত প্রতীকী উপাখ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল বলেই মনে হয়।

তৃতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাওয়া গেল সবথেকে প্রাচীন উল্কাপিণ্ড

অলোকেশ দাশ

আবিষ্কৃত হল বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন উল্কাপিণ্ড। এই পিণ্ডের নাম রাখা হয়েছে Erg Chech 002। এটি প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছরের পুরনো। গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, এই অতিপ্রাচীন উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে পূর্বের সৌরজগৎ সম্পর্কে একটা গভীর ধারণা পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে সৌরজগতের প্রাথমিক স্তর বুঝতেও সাহায্য করবে এই উল্কাপিণ্ডটি।

যে গবেষক দল এই গবেষণাটি চালাচ্ছেন , তার পুরোভাগে ছিলেন অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি-রত এভগেনি ক্রেস্টিয়ানিনভ। তিনিই ২০২০ সালে আলজেরিয়ার সাহারা মরুভূমির এরগ চেচ অঞ্চলে এই উল্কাপিণ্ডটির হদিশ পান। এই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম-২৬।

প্রাচীন কালে গ্রহ গলে যাওয়ার জন্য দায়ী তাপের প্রধান উৎস হিসেবে পরিচিত এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। গবেষকদের দাবি, Erg Chech 002-এ এর উপস্থিতি প্রাচীন কালের সৌরজগৎ সম্পর্কে ধারণা দেবে। Erg Chech 002 হল অ্যান্ডেসিটিক অ্যাকনড্রাইট। বিশ্বের প্রাচীনতম এক ধরনের পাথুরে উল্কাপিণ্ড। তবে যে প্রশ্নটা গবেষকদের বিভ্রান্ত করছে, সেটা হল প্রাচীন সৌরজগৎ জুড়ে কি অ্যালুমিনিয়াম-২৬

সমান ভাবে বন্টন করা ছিল। থাকলে এটাই অন্যান্য উল্কাপিণ্ডের বয়স নির্ধারণের জন্য জরুরি হয়ে পড়তে পারে।

সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করার জন্য উল্কাপিণ্ডের ভিতরের মূল আইসোটোপগুলি নিয়ে গবেষণা চলছে। তাতে জানা গিয়েছে যে, উল্কাপিণ্ডটি প্রায় ৪.৫৬৬ বিলিয়ন বছরের পুরনো। অতিপ্রাচীন উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রারম্ভিক সৌর নীহারিকার মধ্যে এই আইসোটোপটির অসমান বন্টন ছিল। শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়াম-ম্যাগনেশিয়াম অ্যালয়ের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য আপেক্ষিক বছরের পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত বলেই গবেষকরা মনে করছেন।

সম্প্রতি নেচার কমিউনিকেশনসে প্রকাশিত পেপারে গবেষকরা জানিয়েছেন যে, পূর্বে প্রকাশিত ডেটার সঙ্গে তাঁদের বিশ্লেষণ একসঙ্গে মিলিয়ে জানা যাচ্ছে যে, এই অ্যাকনড্রাইটের উৎস উপাদানের মধ্যে প্রাথমিক ধাতু কিন্তু অন্যান্য ভালো ভাবে সংরক্ষিত অ্যাকনড্রাইটের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রকম বেশি।

লেখা ৫

সাবধান হোন বয়েস বাড়লেই

শ্যামল দেবনাথ

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে যে কোনো রোগ জাঁকিয়ে ধরে। বিশেষ করে বয়স ৪০ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে নানা পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। তার মধ্যে অন্যতম হল ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ওজন বাড়ার মতো মারাত্মক সমস্যাগুলো । সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে , ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে যাদের ওজন বেশি হয়, তাঁদের বেশিরভাগেরই জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেশি থাকে। যার কারণে তাঁদের মধ্যে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি একলাফে বেড়ে যায়। ফলে, এই সময়টাতে শরীরের যত্ন নেওয়া সবচাইতে জরুরি, তা না হলেই মারাত্মক বিপদ। গবেষণা বলছে , যাদের স্থূলত্ব রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই বয়সটা মারাত্মক ভয়ঙ্কর। এই বয়সে রক্তে চর্বি, কোলেস্টেরল বা ব্লাড সুগার বেড়ে যায়। সমীক্ষা বলছে, মানুষের অকালমৃত্যুর ঝুঁকিও ৩০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে শরীরে এই ধরনের রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তাই মানুষ টেনশন মুক্ত থাকে এবং মনে করে যে মোটা হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো রোগ নেই। কিন্তু এটি তাদের সবচেয়ে বড় ভুল। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই রোগ গোপনে থাবা বসায়। গবেষকরা যখন উপসর্গ ছাড়াই পরীক্ষা করেন, তখন তার ফলাফল সামনে আসে।

গবেষকরা দেখেছেন যে যাঁদের ওজন বেড়ে গেছে তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো জটিল রোগ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত লোকেদের কার্ডিওভাসকুলার

রোগে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গবেষকরা ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের নিয়ে ৩৪ হাজার মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে ফলাফল পাচ্ছেন তা চমকে ওঠার মতো। সমীক্ষায় উচ্চতা, ওজন, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, রক্তের গ্লুকোজ এবং কোমর এবং নিতম্বের পরিধি পরিমাপ করা হয়েছিল। সুস্থ মানুষের সঙ্গে যখন পাওয়া তথ্য তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায়, যাদের মেটাবলিক সিনড্রোম আছে তাঁদের মধ্যে ১৯ শতাংশই সুস্থ মানুষের তুলনায় অকালে মারা গেছেন। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৪০-৫০ বছর বয়সের মানুষদের অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করে চলা উচিত।

লেখা ৬

চলে গেলেন অস্কার জয়ী চিত্রপরিচালক ফ্রিডকিন

তাপস মুখোপাধ্যায়

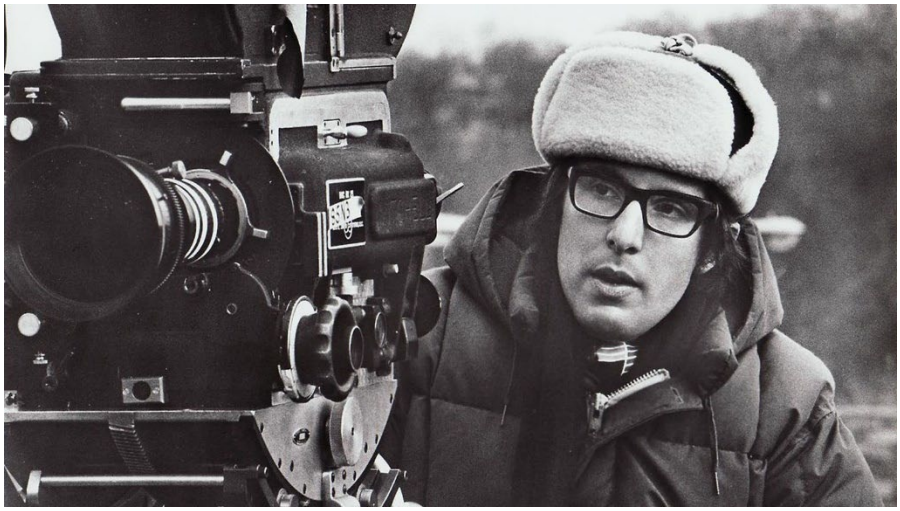

প্রয়াত হলেন অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক উইলিয়াম ফ্রিডকিন। আমেরিকান এই বিখ্যাত পরিচালক বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই স্বাস্থ্য জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে ফের নক্ষত্রপতন ঘটে গেল। সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে মৃত্যু হয় পরিচালক ফ্রিডকিনের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁক মৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়েছে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে।

ডকুমেন্টরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন উইলিয়াম ফ্রিডকিন। সময়টা ১৯৬০-এর দশক। তারপর থেকেই একের পর এক সেরা ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন তিনি। ১৯৭১ সালে ক্রাইম থ্রিলার 'দ্য ফ্রেঞ্চ কানেকশন ' এবং ১৯৭৩ সালের ব্লকবাস্টার 'দ্য এক্সরসিস্ট' পরিচালনা করে বিশ্ব চলচ্চিত্রে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলেন। জিন হ্যাকম্যান অভিনীত এই ছবিটি সেরা পরিচালক এবং সেরা ছবি হিসেবে ৫টি অ্যাকাডেমি পুরস্কার জিতেছিল। 'দ্য এক্সরসিস্ট' সেরা ছবি এবং সেরা পরিচালক হিসেবে ১০টি অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল এবং যার মধ্যে ২টি অস্কার জিতেছিল।

১৯৬৭ সালে হালকা মিউজিক্যাল কমেডি 'গুড টাইমস' দিয়ে কেরিয়ার শুরু করলেও তারপরে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত চলচ্চিত্র তৈরি করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭০ এর দশকে ফ্রিডকিন নিউ হলিউড আন্দোলনের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সেই সময় তরুণ হলিউডি পরিচালকদের মধ্যে তিনি অন্যতম জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

আমেরিকান চলচ্চিত্রকে একপ্রকার নতুন রূপ দিয়েছিলেন ফ্রিডকিন। দীর্ঘ দিনের ছক ভেঙে নতুন দিশা দেখান এই বিখ্যাত পরিচালক। মৃত্যুর বেশ কিছু আগে পর্যন্ত তিনি তার চলচ্চিত্রের কাজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। উইলিয়াম ফ্রিডকিন পরিচালিত শেষ ছবি 'দ্য কেইন মিউটিনি কোর্ট-মার্শাল' চলতি বছর সেপ্টেম্বরে ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হওয়ার কথা রয়েছে। পরিচালক ফ্রেডকিনের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি চলচ্চিত্র জগতের।

লেখা ৭

স্বাদে-নস্টালজিয়ায় অনন্য দিলখুশা কেবিন

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

আধুনিক কলকাতায় নানাস্বাদের বৈচিত্রপূর্ণ একাধিক কুইজিন নতুন নতুন নামে শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে গেলেও কিছু পুরোনো নাম বিরাজ করে চলেছে আজও, স্বমহীমায়-- যাদের সাথে জড়িয়ে সেই কবেকার কলকাতার কথকতা। আর এখানেই অনন্যতম, হেরিটেজ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রেস্তোরাঁ দিলখুশা কেবিন। ঐতিহ্য সম্পন্ন এই রেস্তোরাঁটি বর্তমানে ১৫০ বছরের দোরগোড়ায় পৌঁছেও স্বাদে-নস্টালজিয়ায় সমানতালে আজও মজিয়ে রেখেছে বাঙালিকে।

চাইনিজ-ইন্ডিয়ান-মোগলাই ছুঁয়ে ভূগোলের গণ্ডি ভেঙে যায় বাঙালির রসনায়। তাই তো, চাউমিনের পাশে অনায়াসে জায়গা করে নেয় কাটলেট-কবিরাজি বা বিরিয়ানি-ফ্রায়েড রাইস। মাছেভাতে বাঙালির কাছে এগুলোও আজ যেন হয়ে উঠেছে একেবারে নিজেদেরই খাবার। অনেকটা এই কথা মাথায় রেখেই পসরা সাজিয়েছে দিলখুশা কেবিন। হয়ে উঠেছে বরাবরের নির্ভরযোগ্য নাম। যদিও পেটচুক্তিতে বাজেটের কথা ভেবে বাঙালি জাতি পিছপা হয় না, তবু একঝলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতেই পারে দিলখুশার দামের তালিকায়। সুলভে যদি মেলে স্বাদের বাহার তাহলে কবজি ডুববে তৃপ্তি সহকারেই। এখানে উল্লেখ্য, সর্বনিম্ন ডিশ ৯০ থেকে সর্বোচ্চ রেট ২০০ টাকাতেই সীমাবদ্ধ। ৯০ টাকায় মাটন চপ, ১৩০ টাকায় ব্রেস্ট কাটলেটের মোহময়ী আবেদন যেমন জিভকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তেমনই ডাকে ১৪০ টাকায় চিকেন কবিরাজির গোল্ডেন শরীর। চাউমিন, রাইসের পাশাপাশি এমনই সুলভ মূল্যে জায়গা করে নেয় বিরিয়ানির নবাবি মেজাজ। আর ইউনিক ডিশ হিসেবে যার উল্লেখ না করলেই নয় তা হল -- প্রন কাটলেট এবং প্রন কবিরাজি, যথাক্রমে ১৫০ ও ১৬০ টাকায়। আর সাইড ডিশে, চিলি চিকেনের ঘন

গ্রেভির সসি অবগাহনে ভেসে হাসে চিকেন, রমণীয় হাসির মতো; তেমনই অন্যদিকে আঙুলে ছাড়িয়ে নেওয়া তুলতুলে মাংসের সাথে ঠোঁটে লেগে থাকতে চায় মাটন কষার ঝালঝাল-মাখোমাখো, স্পাইসি আবেদন।

দিলখুশা কেবিন নিয়ে কথা বলতে গেলে অবশ্যই রকমারি স্বাদের এইসব পদের পাশাপাশি কথা বলে উঠবে ইতিহাস ও নস্টালজিয়া। শুরু করা যায় নামকরণ ও অঙ্গসজ্জা থেকেই। রেস্তোরাঁয় 'কেবিন' কালচারের সূচনা গত শতাব্দীর গোড়া থেকেই। মূলত রক্ষণশীল অভিজাত বাঙালি পরিবারের মহিলা ও গৃহবধূদের কথা মাথায় রেখেই রেস্তোরাঁয় প্লাইবোর্ডের পার্টিশন ও পর্দা সহযোগে কেবিন সিস্টেম চালু করা হয়। 'দিলখুশা কেবিন ' -এর প্রতিষ্ঠাতা চুনীলাল দে ঠিক এই সজ্জাতেই তাঁর রেস্তোরাঁটিকেও সাজিয়ে তোলেন। যেখানে সম্ভ্রান্ত গৃহবধূরা তাদের পরিবারের সাথে নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপে বসে আহার ও আলাপ চালাতে পারেন। সময়ের সাথে সাথে পর্দার প্রয়োজন সামাজিকভাবে ফুরোলেও তার কেবিন-মাহাত্ম্য অটুট ছিল। এটাও মনে রাখতে হবে, এবং অবশ্যই ঐতিহাসিক মূল্যেও স্মরণীয় – দিলখুশা কেবিন ছিল কলকাতায় তৎকালীন ভারতীয় বিপ্লবীদের

মিটিং পয়েন্ট। কেবিনের আলতো ঘেরাটোপ তাঁদেরও গোপনীয়তার সহায়ক হয়ে উঠেছিল সেই সময়। দিলখুশা-র স্বাদেগন্ধে মিলেমিশে রয়েছে তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি। পরবর্তীকালে এখানে এসেছেন আরও কত নামীদামি ও গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রপরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। দিলখুশা-র দেয়াল থেকে টেবিল-চেয়ার-মেঝে স্মৃতিধন্য তাঁদেরও। সাহিত্যে-সিনেমায়-গল্পে কতভাবেই না উঠে এসেছে এই রেস্তোরাঁর নাম!

কলেজ স্ট্রিট ও এম. জি. রোড ক্রসিংয়ে আজও সিমেন্টের খোদাই করা অক্ষরে জ্বলজ্বল করে ওঠে দিলখুশা কেবিন-এর নাম। স্বাদেগন্ধে ম-ম করে ওঠে কলকাতার কত কথার কথকতার স্মৃতি।

সুমেরুতে সাতদিন (শেষ ভাগ)

রাজর্ষি পাল

পেশায় চিকিৎসক রাজর্ষি পাল থাকেন ইংল্যান্ডে। একটি বিশেষ মেডিক্যাল ট্রেনিং - এ গিয়েছিলেন সুমেরু অভিযানে। ফিরে এসে লেখা সেই অভিযানের বিবরণ নিয়ে বাংলা স্ট্রিট-এ চলছে একটি ধারাবাহিক। শেষ অংশ রইলো এই সংখ্যায়...

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সকাল বেলায় তাঁবু থেকে বেরতে কষ্ট হচ্ছিল। কষ্ট করে বেরিয়ে এসে মন ভরে গেল। বরফের পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় ক্যাম্প গামা। পেছনে বরফে ঢাকা পাইন গাছের জঙ্গল। তাঁবু গুলোর পেছনে সারি দিয়ে বরফের মধ্যে গেঁথে রাখা স্কি এবং স্কি পোল গুলো। এত ঠাণ্ডায় টয়লেটের কাজ যেন এক দুর্বিষহ ব্যাপার। টেন্ট গুলোর পেছনে টিলার আড়ালে একটা পাইন গাছের তলায় বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে সাময়িক টয়লেটের ব্যাবস্থা। কিন্তু ধরা চুড়া খুলে এই হিমাঙ্কে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া এক নিষ্ঠুর শাস্তি।

এক এক করে সবাই বেরিয়ে এল। ক্যাম্পের চারপাশে বরফের ওপর স্কি করতে ব্যাস্ত অনেকে। সবার মধ্যেই এক ফুর্তির আমেজ। দুপুরে আমাদের টেন্টের মধ্যে হল GPS বা Global Positioning System এর ওপর লেকচার।

GPS আজকালকার দিনে যে কোন অভিযানের এক অতি প্রয়োজনীয় উপকরন। ওয়াকই টকির মতন দেখতে, উপগ্রহের মাধ্যমে দিক নির্ণয় করা যায়। গন্তব্য স্থানের অক্ষাংশ – দ্রাঘিমাংশ টাইপ করে দিলে নিজে থেকেই তীর চিহ্ন দেখিয়ে গন্তব্য স্তানের যাত্রা পথ নির্ণয় করে দেবে। পর্বত নদী বা কোন প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হলে নিজে থেকেই নতুন পথের সন্ধান দেবে।

দুপুরে খাওয়ার পরে হল GPS ব্যাবহার করার হাতে কলমে পরীক্ষা। ক্যাম্প থেকে দূরে বরফের মধ্যে ইন্সট্রাকটার রা ছোট খাটো জিনিস লুকিয়ে রেখে আমাদের দিলেন আনুমানিক অবস্থান। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জিপিএস ব্যাবহার করে আমাদের লুকনো জায়গা থেকে সেগুল খুজে আনতে হল। বেশ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

দিনে সূর্য দেখা গেল ঘন্টা দুয়েক এর জন্য। আবহাওয়া পরিস্কার। আগের দিনের তুষার পাত থেমে গেছে ভোর রাতেই। যদিও সূর্যদেব রইলেন ঘন্টা দুয়েক, তবু তার আগে এবং পরে ঊষা এবং গোধূলির আলো রইল আরও কিছুক্ষণ। আলো থাকতে থাকতেই রুক স্যাক গুছিয়ে শাবল গাইতি নিয়ে বরফ ভেঙ্গে আমরা রওনা দিলাম। বেশ কিছুটা দূরে এক বরফের পাহাড়ে গুহা খুঁড়ে সেখানে থাকার ব্যাবস্থা করতে হবে। চারজন করে এক একটা দলে ভাগ হয়ে বরফের প্রাচীরে গর্ত খোঁড়া শুরু হল। শুনতে যতটা সহজ, বাস্তবে ততটাই কঠিন। বাইরের নরম বরফের আস্তরণ সরিয়ে ভেতরের পাথরের মতন শক্ত বরফে গর্ত খোঁড়া এক দুর্বিষহ ব্যাপার। ঘন্টার পর ঘন্টা কেতে যেতে লাগলো। পালা করে আমরা দুজন শাবল আর গাইতি নিয়ে শক্ত বরফে আঘাত করে গুহা মুখ তৈরিতে ব্যাস্ত হলাম। ইতিমধ্যে নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। হু হু করে তাপমাত্রা কমে গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় মাইনাস পঞ্চাশে। কিন্তু তাতেও আমাদের গলদঘর্ম অবস্থা। গুহা খুড়তে শুরু করলে ঘামছি, আর থামলেই মুহূর্তের মধ্যে মেরুর হিম-শিতলতা। জীবনের নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এ এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। টর্চের আলো জ্বালিয়ে চলতে লাগলো আমাদের এই গুহা খোঁড়ার অভিযান। আকাশে দেখা দিল অ্যারোরা বোরিয়ালিস। নিকষ কালো অন্ধকার আকাশে সরপিল গতিতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে রঙিন আলোর বিচ্ছুরণ। ধীরে ধীরে পালটাচ্ছে রঙ। কখনো বা মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা দেখা দিচ্ছে আকাশের অন্য এক প্রান্তে। মন্ত্র-মুগ্ধের মতন হাতের কাজ ফেলে শীতল আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমরা।

প্রায় ঘন্টা ছয়েক পর সাঙ্গ হল আমাদের গুহা খোঁড়া অভিযান। এক একটা গুহাতে তিন থেকে চারজন করে। গুহার মধ্যে আবার দুপাশে গর্ত খুঁড়ে মেঝে থেকে কিছুটা ওপরে চাতালের মতন ব্যাবস্থা, সেখানে শুয়ে নিশি যাপন। বরফের চাঙড় থাক থাক

করে বসিয়ে গুহার মুখটা একদম নিচু করে দেওয়া হল। কিছুটা ইগলুর মতন। ঢুকতে বা বেরোতে হবে হামাগুরি দিয়ে। ভেতরে যাতে গরম হাওয়া আটকে থাকে। চাতালের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হল স্লিপিং ম্যাট্রেস এবং বল্গা হরিণের চামড়া। যদিও ভেতরের উত্তাপ বাইরের থেকে যথেষ্ট আরামদায়ক, তবুও যথেষ্ট শীতল। গুহাতে আমার সঙ্গী হল এক্সেল এবং মিশেল। এক্সেল সুইডেনের প্যারামেডিক এবং মিশেল আস্ট্রেলিয়ান নার্স।

হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বাকিদের সাথে মোলাকাত, তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে নিশিযাপনের প্রস্তুতি। রুক স্যাক খুলে ভেতরের জিনিসপত্র বের করা হল। মোমবাতির আলোয়ে গরম করে খাওয়া হল রাংতায় মোড়া প্যাকেটের ডিনার। এক্সেল এবং মিশেলের সাথে তোলা হল কিছু ফটো – বরফের গুহায় নিশি যাপনের কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এরপর স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে নিদ্রার প্রচেষ্টা।

যদিও সারাটা দিন কেটেছে শারীরিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, তবু ঘুম খুব গভীর হল না। অদ্ভুত এই এস্কিমো পরিবেশে রাত কাটল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

ভোরবেলায় কোনরকমে প্রাতরাশ সেরে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসা। দিনের আবছায়া আলোয় বরফের পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা গেল দূরে আমাদের ক্যাম্প গামা এবং বরফের আস্তরণে ঢাকা আমাদের টেন্ট গুলো।

পাহাড় থেকে নেমে আমরা ফিরে এলাম ক্যাম্পে। এবার তাঁবু গুটিয়ে বেস ক্যাম্পে ফেরার পালা। সবাই মিলে হাত লাগালাম। বেশ জটিল কাজ। বরফ ঝেড়ে টেন্টগুল খুলে ভাঁজ করে রাখা এবং টেন্ট পোল গুলোকে খুলে ফোল্ড করে গুছিয়ে রাখা, তারপর হিসসেব মেলানো। এছাড়াও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলা – ঘন্টা দুই সময় লাগলো প্রায়। মালপত্র স্লেজ গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। এবার রুক স্যাক পিঠে নিয়ে পায়ের জুতোতে লাগিয়ে নেওয়া হল স্কি পোল। এবারে ক্রস কান্ট্রি স্কি করে বেস ক্যাম্পে ফিরে চলা।

ধু ধু বরফের ওপর দিয়ে শুরু হল ক্রস কান্ট্রি স্কি। আগের দিনের চাইতে অনেক ভালো স্কি করে দুঃখ দূর করলাম। বরফের মরুভূমির ওপারে দেখা দিলেন সূর্যদেব। দিক্কিদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল সূর্যালোকিত স্বর্ণাভ প্রদেশ। পিঠে রুক স্যাক নিয়ে লাইন

করে স্কি করে সূর্যালোকিত মেরু প্রদেশের ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। পেছনে পড়ে রইল ক্যাম্প গামা।

পেরিয়ে চললাম বরফে ঢাকা ঊষর মেরু দেশ, পেরিয়ে চললাম বরফে ঢাকা অরণ্যানী, পেরিয়ে চললাম বরফে ঢাকা উপত্যকা, হ্রদ এবং নদনদী। বরফে ঢাকা পাইন গাছের আড়াল দিয়ে ঝক ঝক করতে লাগলো সূর্য-স্নাত পরিস্কার আকাশ। গত দুদিনে কোন তুষার পাত হয় নি। প্রায় ঘন্টা তিনেক পড়ে পৌঁছালাম বেস ক্যাম্পে। সকলেই প্রায় বিধ্বস্ত। খাবার ঘরে গিয়ে গোগ্রাসে গ্রাসাচ্ছাদন। কিন্তু নিস্তার নেই। মেরু অভিযানের আরও পালা বাকী আছে, বোধহয় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক পালা।

খাবার পড়ে রুক স্যাক তুলে আবার বাইরে। বরফের ওপর দিয়ে অনেকটা হেঁটে জমে যাওয়া বরফের হ্রদের মাঝখানে এলাম সকলে। বিশাল ইলেকট্রিক করাত দিয়ে বরফের বিশাল বিশাল চাঙ্গর কেটে পরিস্কার করা হয়েছে কিছুটা, দেখা যাচ্ছে বরফের গভীরে জলাশয়। এখানে হবে সবচাইতে চিত্তাকর্ষক পর্ব। এই হিমশীতল জলে আমাদের লাফিয়ে পরতে হবে এক এক করে। অবশ্য কোন জোরাজুরি নেই। যারা চাইবে না, তারা দাড়িয়ে শুধু তামাশা দেখতে পারে। কোমরে দরি বেঁধে অ্যাডী প্রথমে ঝাঁপ দিলেন এবং সাঁতার কেটে জল থেকে উঠে এলেন। অনেক সময় স্কি করতে গিয়ে নরম বরফের তলায় জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। সেখেত্রে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তারই হাতে কলমে শেখার পর্ব।

দোনা মোনা করে একদুজন ঝাঁপ দিল কাপর জামা শুদ্ধ এবং দাঁত কপাটি লাগাল। টেনে তুলে আনা হল কোমরে বাঁধা দড়ি ধরে।

দড়ির অন্য প্রান্তে নূট এবং কেরি। প্রায় ফ্রস্ট বাইট হবার অবস্থা। তোয়ালে পেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠানো হল কিছু দূরে একটা কাঠের কেবিনে, তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাবার জন্যে।

ইতস্তত করে আমিও ঝাঁপ দেব স্থির করলাম। তবে আরেকটু বেশী মাত্রায়। অনেক ছোট বেলা থেকেই শুনেছি তিব্বতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই ধরনের বরফ গলা জলে বসে বা দাড়িয়ে কৃচ্ছতার সাধনা করেন। মনে পড়ে গেল ডিসকভারি চ্যানেলে দেখা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর ডকুমেন্টারি। জামাপ্যান্ট খুলে শুধু অন্তর্বাস পড়ে এসে দাঁড়ালাম বরফের ওপরে জলের ধারে। অন্যেরা হতবাক। এতবড় দুঃসাহস কেউ কল্পনা করতে পারে নি। যাইহোক বুক ভরা দম নিয়ে ইষ্টকে স্মরন করে ঝাঁপ দিলাম জলে। ডুবে গেলাম অনেকটা গভীরে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা কাকে বলে অনুভব করলাম রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বুকে ধরে রাখা দমের টানে কয়েক মুহূর্ত বাদে ভেসে উঠলাম, সাঁতার কেটে পউছালাম বরফের পাড়ে। কনুইয়ে চাপ দিয়ে উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম ব্লেদের মতন ধারাল বরফের ধারটা, ক্ষত বিক্ষত হল হাঁটু এবং কনুই। নূট এবং কেরি এগিয়ে এলেন উদ্ধার পর্বে, কোমরে বাঁধা দড়ি টেনে দাড় করালেন। দুটি স্কি স্টিকের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সারা শরীরে কোন সাড় নেই, পায়ের তোলা মমের মতন নিঃসাড়। টলতে টলতে গেলাম কিছু দূরে দাঁড়ানো একটা কাঠের স্লেজের দিকে। তার ওপর উঠে দ্রুত শরীর মুছে পরলাম সঙ্গে করে আনা উষ্ণ পোশাক। ধাতস্ত হতে বেশ সময় লাগলো। তবে পায়ের তলায় সাড় পুরোপুরি ফিরতে সময় লেগেছিল প্রায় মাস তিনেক।

এর পরে আবার ফিরে আসা বেস ক্যাম্পে। ইতিমধ্যে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে তুষারপাত। কাঠের বিশাল হলঘরে খাওয়া- দাওয়া, গল্প আর আড্ডা। এই কদিনে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তার বন্ধন। রাতের বেলায় বেস ক্যাম্পের কর্মচারীরা পরিবেশন করলেন নরডিক লোকগীতি। অনন্যারাও যে যার মতন করে অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন।

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

পরদিন ভোরে বাসে করে ফিরে আসা অল্টা এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ছোট বিমানে ট্রমসো। ট্রমসো তে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে বিমানে অসলো, এবং অসলো থেকে হিথরো গামী বিমানে লন্ডনে ফিরে আসা – আমার কর্ম-স্থলে...

অজানার উজানে (দ্বিতীয় ভাগ)

বাবলু সাহা

এই বাংলার আনাচে কানাচে রয়েছে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের জন্য দারুন দারুন সব জায়গা। এরকমই একটি জায়গার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে গত সংখ্যায় শুরু হয়েছিল নতুন ধারাবাহিক। দ্বিতীয় অংশ রইলো এই সংখ্যায়…

দুজনে কিছুক্ষণ নামার পরে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে সামনের চলার ব্রাস্তা ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ে পুরোটাই বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো উপায়ই নেই নেছে নামবার। অগত্যা কী আর করা, আমরা আবার সেখান থেকে ফিরে এসেওন্য একটি রাস্তা (?) ধরেনামার চেষ্টা করলাম।

একটু বাদেই বুঝলাম এটিও আগের মতোই ভুল রাস্তা।এভাযাবে বারবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিচে নামার পথ কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। অথচ উপর থেকে কোনো কোনো বাঁক থেকে অনেক নিচে আমাদের মারুতি ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এত উপর থেকে গাড়িটাকে একদম খেলনার গাড়ির মতো দেখাচ্ছিল। সোনু আর আমি দুজনেই এবার একটু দমে গেছি। গাড়ি দেখতে পাচ্ছি অথচ নেমে যে সেখানে যাব তার কোনো পথ নেই। এ তো মহা বিপদ হল ! কী করি কী করি ভাবতে ভাবতে সোনুই বুদ্ধি করে চট্টোদাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করতে থাকল। লাইন পাওয়া যাচ্ছে না।হাত-ফাত রীতিমতো কাপছে। ও আমি দুজনে অনেক বার চেষ্টার পর ফোনে লাইন পাওয়া গেল। অল্প কথায় চট্টোদাকে বিপদটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে কী লাভ ? চট্টোদাই বা কী করবেন ওই অত নিচে থেকে ! তার ওপর একে মানুষটার কোমর ভাঙা তার ওপর ক্লাইম্বিং-ও জানেন না। খোঁড়া

পা নিয়ে বেচারি যে দূরের গ্রামে গিয়ে কাউকে ডেকে এনে আমাদের উদ্ধার করবেন তার উপায়ও নেই। দু-এক জন গ্রামবাসী যারা গরু ছাগল চরাতে এসেছিল তারাও যে যার পথে চলে গেছে। চারদিক শুনশান।

এদিকে সময় যত যাচ্ছে সোনুর মুখ ভয়ে চিন্তায় শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে। অনেকক্ষণ বাদে দেখি কী, নিচে বা দিকের লাল মাটির পথ ধরে এক ভদ্রলোক সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে কোথাও চলেছেন। তাঁকে দেখেই সোনুর মুখ দেখলাম কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যের মতো গায়ের জামাটি খুলে প্রবল চিৎকার শুরু করল। কিন্তু যতই চেচাক সে গলার আওয়াজ শুনবে কে ! সে চিৎকার কারো কানে পৌছলে তবে তো কথা !

এবার জঙ্গলের একটু বিবরণ দিই। তার আগে বলে রাখি আমাদের কাছে কিন্তু জল;এর বোতল বা শুকনো খাবার-দাবার কিছহু ছিল না। যাই হোক, এক কথায় সে এক অসামান্য সুন্দর একটি জঙ্গল। প্রায় অনাঘ্রাত বুনো ফুলের মতো এ জঙ্গলে কেউ কদাচ পা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না। একমাত্র সঙ্গীর যখন কখন কীভাবে নিচে নামবে সেই ভাবনায় ধাত ছেড়ে যায় যায় অবস্থা আমি কিন্তু তার মধ্যেও চারদিকে দেখেশুনে জায়গাটাকে যথাসম্ভব ছকে নিতে চাইছি।মনের ক্যামেরায় যতখনি সম্ভব ছবি তুলে রাখতে চেষ্টা করছি।যেহেতু বিভিন্ন দিক দিয়ে পাহাড় থেকে নামার চেষ্টা করেছিলাম ফলে পাহাড়ের এক এক জায়গার এক এক রূপ প্রত্যক্ষ করা বলতে যা বোঝায় তাও হয়ে গিয়েছিল।

এক জায়গার জঙ্গলে দেখেছিলাম মনে আছে অসংখ্য লম্বা লম্বা শর গাছের মতো দেখতে এক ধরনের গাছে অদ্ভুত সুন্দর ফুল ধরেছে। সেই ঘন জঙ্গল থেকে কোনো রকমে বেরিয়ে আরেক জায়গায় দেখলামনেকটা জায়গা জুড়ে আরেক জাতের ফুল। সে ফুল অনেকেই কলকাতায় শীতকালে

ফুটপাথে বড়ো গামলায় করে ভিজিয়ে রাখতে দেখে থাকবেন। সে ফুলের নাম জানি না, তবে অনেক বাড়িতে লম্বা মুখওয়ালা ফ্লাওয়ার ভাসে থাকতে দেখেছি। এই বিশেষ ধরনের ফুলগুলির বিশেষত্বই হল এর পাপড়িগুলো গুটলি পাকানো অবস্থায় থাকে। চোখে পড়ল বিভিন্ন ধরনের বরো বা ছোটো আকারের গাছ যাদের সারা গা জুড়েই নানা আকারের কাঁটা বেরিয়ে রয়েছে। এসব দেখছি বটে কিন্তু নিচে কীভাবে নামব মাথায় আসছে না।

তৃতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ১০

রবীন্দ্রনাথের গানে নিজেকে হারিয়ে খোঁজা

অলোক দেব

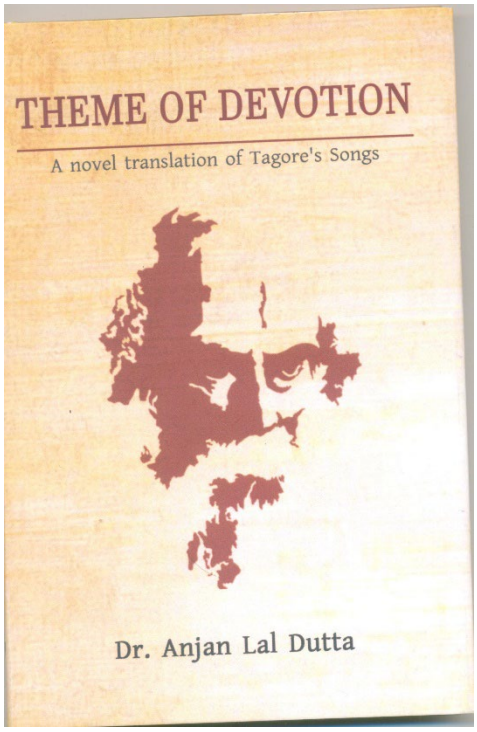

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে দিগন্তকে ছুয়েছিলেন সেই দূর দিগন্তের ইশারাকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হার্ট স্পেশালিস্ট, আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিয়লজির ফেলো ডক্টর (প্রফেসর) অঞ্জনলাল দত্ত সম্প্রতি কবি চল্লিশটি নানা পর্যায়ের গানকে ইংরেজিতে কেবল অনুবাদই করেননি, সে অনুবাদকে যথার্থ সুরের সহযোগিতায় আমাদের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দেবার যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। বলা বাহুল্য গানকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানকে, তাদের সুর যথাযথ রেখে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ বাঙালি সংস্কৃতির এই অন্ধকার সময় বসে নেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। ডক্টর দত্ত অবলীলায় সেই কঠিন কাজ কেই সম্পন্ন করে আপামর বাঙালি শ্রোতা, এবং সার্বিক অর্থে বাঙালির কাছে ধন্যবাদারহ হয়েছেন। ফলত এ বইকে তথা অনূদিত গান গুলিকে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রকাশনা এগিয়ে এসে আমাদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এডিনবরা নাপিয়ের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমেরিটাস অফ ইংলিশ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ রাইটিং এবং এবং স্কটিশ সেন্টার অফ ট্যাগোর স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর ডক্টর বাসবী ফ্রেজার , সিবিই এ বইয়ের ভূমিকায় যথার্থ বলেছেন,' This collection has been brought together to be read and sung, so while they will be treasured in a book, they welcome vocalists in India and worldwide ----- Indians in India and the diaspora, who may not know Bengali, those of the first second and third generation Indians and English speaking audiences, to sing and share them with friends and at gatherings. ' অসামান্য এ বইয়ের মুখবন্ধে নোবেল স্বীকৃতি পাওয়া প্রখ্যাত

অর্থনীতিবিদ

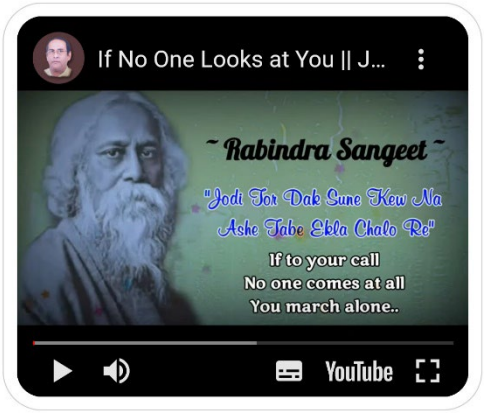

অমর্ত্য সেন এই সৃষ্টির প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, it is never easy to rush ahead with totally new writings. The task is much harder if the meaning of the passage has to be changed while actually engaged in translating. It is Dr. Anjan Dutta's exceptional talent ----as a writer in addition to his medical skills----it is made it possible for him to bring about such extraordinary accomplishments.' ডক্টর দত্তের অসামান্য এই প্রচেষ্টাকে চিত্রিত করতে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর পবিত্র সরকার বলেছেন, one has nothing but praise 40s passionate urgency to get the best products of his culture that goes to others, living beyond tagor's language...' অসামান্য সংকলনটির বিপুল সমাদর হোক পাঠক হিসেবে এটাই আমাদের কাম্য।

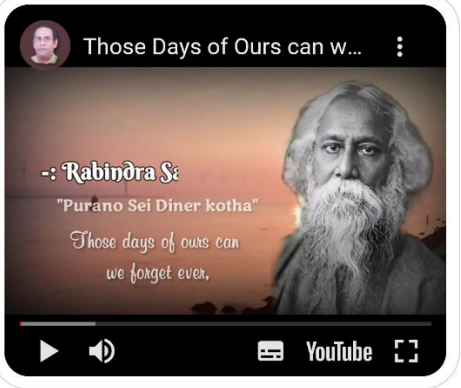

থীম অফ ডিভোশন : ড. অঞ্জনলাল দত্ত, দাঁড়াবার জায়গা, ৩৫০ টাকা

লেখা ১১

প্লেয়ার তৈরি করতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়

প্রণব দত্ত

মি. রাইডার বাংলা স্ট্রিট পত্রিকার তরফ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এই সাক্ষাৎকার শুরু করছি। আপনার পুরো নাম ফিলিপ ডি রাইডার। আপনি এক সময় এই শহরের প্রিয় মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কলকাতা তথা ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সফল কোচ হিসাবে অগণিত সমর্থকের ভালোবাসা পেয়েছেন। এই বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কি ?

রাইডার: ধন্যবাদ । আমি যদিও বর্তমানে ফ্রান্সের একটি শহরে আছি তবুও কলকাতা আমার কাছে স্পেশাল। এই শহরের ফুটবল আবেগ ইউরোপের যে কোনো ক্লাবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমি কৃতজ্ঞ আমাকে এত মানুষ ভালোবেসেছেন বলে।

প্রণব: আলোচনার শুরুতেই আপনাকে জানাতে চাই আমরা অতি সম্প্রতি ভারতের বিখ্যাত খেলোয়াড় মোহাম্মেদ হাবিবকে হারিয়েছি। আপনি যখন হলদিয়া কোচিং

একাডেমিতে ছিলেন সেখানে মহ হাবিবও ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আপনার কোনো পরিচয় হয়েছিল ?

রাইডার: হ্যাঁ , আমি হলদিয়া কোচিং একাডেমিতে ছিলাম। আমাকে এখানে নিয়ে আসেন মি সঞ্জয় ব্যানার্জি। মি হাবিব থাকলেও আমার সঙ্গে সেভাবে পরিচয় হয়নি। তবে যেটুকু দেখেছি উনি অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন। ওঁর খেলা আমি দেখিনি তবে কোচ হিসাবে ওঁকে দেখছি। হলদিয়া থেকে আমি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আসি আর মি হাবিব মহামেডান ক্লাবের কোচ হন। আমার মনে প্রথম খেলাতেই আমরা ১-০ গোলে জিতি। গোল করেছিলেন বাইচুং ভুটিয়া।

প্রণব: হলদিয়া কোচিং একাডেমি থেকে কোনো খেলোয়াড় কি কলকাতার নামি দলে সুযোগ পেয়েছিল ?

রাইডার: এই মুহূর্তে দুজনের নাম মনে পড়ছে, অনুপম সরকার আর একজন জয়ন্ত সেন।

প্রণব: ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

রাইডার: আমি প্রায় সতেরো বছর ওখানকার ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। প্রথম কথা কোয়ালিটি দল করতে গেলে কোয়ালিটি খেলোয়াড় প্রয়োজন। আর কোয়ালিটি প্লেয়ার তৈরি করতে গেলে ফুটবল প্রশাসনকে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। তবে আমার মতে ভারতের ফুটবল ফেডারেশন সঠিক পথেই চলেছে। ভালো ফুটবলার তৈরি করার পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। জাপান,দক্ষিণ কোরিয়া, চিন এই ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে আছে। ইন্ডিয়াও যথেষ্ট শক্তিশালী, এইতো দেখা গেল ইরাকের মতো দলের সঙ্গে সমানে লড়াই করে পেনাল্টিতে হার স্বীকার করতে হল। কোচ ইগোর সঠিক পথেই দলকে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে কোচ তো মাঠে নামবেন না।

প্রণব: আপনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ হিসাবে ২০০৫-৬ এবং২০০৯-১০ সালে যুক্ত ছিলেন,এই সময় আপনার কোচিং-য়ে ক্লাব ফেডারেশন কাপ এবং সুপার কাপ জয়ী হয়,এর ফলে একজন সফল কোচ হিসাবে আপনার জনপ্রিয়তা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

রাইডার: এই জন্য আমি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রণব: আপনি অনূর্ধ্ব কুড়ি বেলজিয়াম জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও ইউনাইটেড সিকিম দলের কোচ হয়েছিলেন। কলকাতার সঙ্গে এখন কোনো যোগাযোগ আছে ?

রাইডার: কলকাতায় আমার অনেক বন্ধু আছে।

প্রণব: আপনি বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক স্পোর্টস বিপণন সংস্থার CEO, অর্থাৎ খেলাধুলো জগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার কি ধারণা?

রাইডার: আমি খুব আশাবাদী যে, ভারত খুব শীঘ্রই বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে যেতে পারবে।

প্রণব: ধন্যবাদ মি.রাইডার আমাদের এতটা সময় দেবার জন্য।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন